بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ জুন, ২০২৩ মোতাবেক ০৯ এহ্সান, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হিজরত পরবর্তী বা হিজরতোত্তর প্রাথমিক পরিস্থিতি, বদরের যুদ্ধের বিভিন্ন কারণ আর মক্কার কাফিরদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ও তাদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.) যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছিল। বদরের যুদ্ধের পূর্বেও কিছু সারিয়্যা এবং গযওয়া সংঘটিত হয়েছে, এখন প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলোর উল্লেখ করব। এরপর মক্কার কাফিরদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির কিছু চিত্রও তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত হামযার সারিয়্যা বা অভিযান। মহানবী (সা.) প্রেরিত এটি প্রথম সারিয়্যা ছিল যা প্রথম হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছে। এটিকে **'সারিয়্যা সীফুল বাহার'** বলা হয়। এটির পতাকা ছিল সাদা আর এর পতাকাবাহক ছিলেন আবু মারসাদ গানভী (রা.)। এই সারিয়্যা তিনি (সা.) প্রথম হিজরীর রমযান মাসে প্রেরণ করেন। আর নিজের চাচা হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-কে এর আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁর সাথে ত্রিশজন মুহাজির আরোহী ছিল। তারা 'ঈস'-এর পার্শ্ববর্তী লোহিত সাগরের তীর পর্যন্ত যান আর কুরাইশের একটি কাফেলা, যা আবু জাহলের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে আসছিল, তাদের মুখোমুখি হন। 'ঈস' রাবেক-এর উত্তরে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। যা **সানীয়াতুল মারা**'র পাশে অবস্থিত। আর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রাবেক-এর দূরত্ব প্রায় ২৪০ কিলোমিটার। এখানে **যুনাবাতুল ঈস** নামের একটি ঝরনা ছিল যার আশপাশে বাবলা ইত্যাদি গাছের আধিক্য ছিল। এ কারণে এটিকে ঈস বলা হয়। এখানে বনু সুলায়েম গোত্র বসবাস করত। সিরিয়া গমনকারী কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলাগুলো এপথ দিয়েই যেত। উভয় পক্ষ মুখোমুখি সারিবদ্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল, কিন্তু গোত্রের এক নেতা মধ্যস্ততা করে আর উভয় পক্ষ ফিরে যায়।

এরপর রয়েছে **উবায়দাহ্ বিন হারেস-এর সারিয়্যা বা অভিযান**। প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত উবায়দাহ্ বিন হারেসকে ষাটজন মুহাজিরের নেতৃত্বে রাবেক-এর নিকটে সানীয়াতুল মারা' অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি আবু সুফিয়ান এবং তার দুইশ' সাথীর মুখোমুখি হন। উভয় পক্ষের মাঝে কিছু তির নিক্ষেপ করা হলেও যথারীতি যুদ্ধ হয়নি। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) সেদিন প্রথম তির নিক্ষেপ করেন। এর পূর্বে কখনো মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে তিরন্দাজি হয়নি। অর্থাৎ এটি ইসলামের ইতিহাসে (নিক্ষিপ্ত) প্রথম তির ছিল যার জন্য হযরত সা'দ যথার্থই গর্বিত ছিলেন। এরপর উভয় পক্ষ নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। **'সানীয়াতুল মারা'** রাবেক শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত আর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এর দূরত্ব হলো ২০০ কিলোমিটার।

এরপর রয়েছে **হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র সারিয়্যা**। প্রথম হিজরী সনে এবং কতকের ভাষ্যমতে দ্বিতীয় হিজরী সনে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে *[(সারিয়্যা সেসব অভিযানকে বলা হয় যাতে মহানবী স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি আর গযওয়া সেসব অভিযান যাতে মহানবী (সা.) নিজে অংশ নিয়েছেন]* বিশজনের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন আর নির্দেশ দেন যে, তারা যেন খারা'র উপত্যকা অতিক্রম না করেন। তারা পায়ে হাঁটতে থাকেন। দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন আর রাতে সফর করতেন। অবশেষে তারা খারার-এ পৌঁছে যান। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাধাগ্রস্ত করা। কিন্তু এই দলটি যখন খারার-এ পৌঁছে তখন তারা জানতে পারেন যে, কাফেলা পূর্ববর্তী দিন এপথ অতিক্রম করে চলে গেছে। অতএব তারা কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই ফিরে আসেন। খারার সম্পর্কে লেখা আছে যে, এর অর্থ হলো সশব্দে বহমান পানি। হেজাযের জুহফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম হলো খারার।

অতঃপর **ওয়াদ্দান-এর যুদ্ধ কিংবা আবওয়া'র যুদ্ধ**। (এটি) দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসের ঘটনা। দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসে মহানবী (সা.) ষাট-সত্তরজন মুহাজির সাথে নিয়ে আবওয়া কিংবা ওয়াদ্দান অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতিহাসবিদ ইবনে সা'দ-এর মতে, এটি প্রথম যুদ্ধ যাতে মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে মদীনায় তাঁর নায়েব নিযুক্ত করেন। তিনি (সা.) আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার পথরোধ করা, কিন্তু তাঁর (সা.) সেখানে পৌঁছার পূর্বেই তারা বের হয়ে গিয়েছিল। এখানে তিনি (সা.) বনু যামরা'র সর্দার মাগশী বিন আমর যামরী'র সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। এই সন্ধি হয় যে, তিনি বনু যামরা'র ওপর আক্রমণ করবেন না এবং বনু যামরাও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম হাতে নেবে না আর কোনো কার্যক্রমে অংশও নিবে না। তাঁর কোনো শত্রুকে সাহায্যও করবে না। এ সফরে তিনি (সা.) পনেরো দিন মদীনার বাইরে ছিলেন। ওয়াদ্দান স্থানটি সম্পর্কে লেখা আছে যে, এটি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান, যা আবওয়া থেকে তেরো কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এখানে মহানবী (সা.)-এর সম্মানিত মাতা সমাহিত আছেন। জুফা থেকে এর দূরত্ব প্রায় একশ কিলোমিটার। আমি যে এই স্থানগুলোর নাম বলে দেই আর এ সংক্রান্ত কথা বর্ণনা করি এর কারণ হলো, কতক আহমদী যারা সেখানে ভ্রমণ করে বা উমরা করতে যায়, তারা ইতিহাস জানা থাকার কারণে সেসব স্থানেও যাওয়া পছন্দ করে, তাই এভাবে সেসব স্থানের কিছুটা পরিচয় ফুটে ওঠে।

বুওয়াত এর যুদ্ধ। দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন এবং নিজের দু'জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে কুরাইশের কাফেলার পথরোধ করার জন্য বের হন। এই কাফেলায় উমাইয়্যা বিন খালফও ছিল এবং একশ' অন্যান্য কুরাইশ এবং দু'হাজার পাঁচশ উট ছিল। তিনি **রিযওয়া**'র সীমান্তে বুওয়াত-এ পৌঁছেন, কিন্তু সেখানে কারো সাথে লড়াই হয়নি এবং তিনি (সা.) মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন। এ যুদ্ধে পতাকার রং ছিল সাদা, যা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বহন করছিলেন। বুওয়াত সম্পর্কে লেখা আছে যে, এটি **জাহিনা গোত্রের** দু'টি পাহাড় যা মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত। এর পাশেই রিযওয়া'র বিখ্যাত পাহাড় অবস্থিত। মদীনা থেকে বুওয়াত-এর দূরত্ব প্রায় একশ' কিলোমিটার।

উশায়রা'র যুদ্ধ। মহানবী (সা.) সংবাদ লাভ করেন যে, কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মক্কা থেকে বের হয়েছে এবং মক্কাবাসীরা এই বাণিজ্যিক কাফেলায় নিজেদের সমস্ত

সম্পদ বিনিয়োগ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এতে লব্ধ মুনাফা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করা। অতএব মহানবী (সা.) দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা কিংবা এক রেওয়ায়েত অনুসারে জমাদিউস্ সানী (মাসে) মদীনা থেকে দেড়শ' কিংবা দুইশ' সদস্য সাথে নিয়ে সফরের সংকল্প করেন। তিনি (সা.) যখন উশায়রা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তিনি জানতে পারেন যে, কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলা তাঁর (সা.) পৌঁছার কয়েক দিন পূর্বেই সেপথ অতিক্রম করে চলে গেছে। **মক্কা ও মদীনার মাঝখানে বনু মুদলেজ-এর এলাকায় ইয়ামবু'র সীমান্তের একটি এলাকার নাম ছিল উশাইরা**। তিনি (সা.) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং বনু মুদলেজ ও বনু যামরা'র মিত্রদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন আর এরপর মদীনায় ফিরে আসেন। এটি মক্কার কুরাইশের সেই বাণিজ্যিক কাফেলা ছিল যার সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পথে মহানবী (সা.) পুনরায় এটির পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন আর বদরের যুদ্ধ হয়েছিল।

বদরুল্ উলার যুদ্ধ। মহানবী (সা.) যখন উশায়রা'র যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসেন তখন দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই **কুরয বিন জাবের** মদীনার চারণভূমিতে আক্রমণ করে বসে। মহানবী (সা.) তার পশ্চাদ্ধাবনে বের হন। তিনি (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) বদরের নিকটবর্তী সাফওয়ান নামক উপত্যকায় পৌঁছেন। সাফওয়ান বদরের পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যকার নাম। কিন্তু কুরয বিন জাবের ত্বড়িৎ সেখান থেকে চলে যায় ফলে তিনি (সা.) তার নাগাল পান নি। এই যুদ্ধকে বদরুল্ উলা বা বদরের প্রথম যুদ্ধও বলা হয়। এরপর মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন। বদরুল্ উলা (বা বদরের প্রথম যুদ্ধ) বলার কারণ হলো, বদরের পার্শ্ববর্তী সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী পৌঁছেছিল। সীরাতুল হালবিয়ায় এটি বর্ণিত হয়েছে। কুরয বিন জাবের সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বিস্তারিত যা লিখেছেন, (তা হলো) তিনি বলেন;

কুরয বিন জাবেরের এই আক্রমণ কোনো বেদুঈনসুলভ সাধারণ লুটতরাজ ছিল না। বরং নিশ্চিতরূপে সে কুরাইশের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ দূরভিসন্ধি নিয়ে এসেছিল। বরং সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তাকে লক্ষ্যে পরিণত করাই তার মূল অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মুসলমানদের সতর্ক দেখে সে কেবল মুসলমানদের উট চুরি করেই পালিয়ে যায়। এথেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, মক্কার কুরাইশরা মদীনার ওপর বার বার অতর্কিত আক্রমন করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। (এখানে) এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যদিও এর পূর্বেই মুসলমানরা সশস্ত্র জিহাদের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছিল। আর সে অনুযায়ী তারা আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণও আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তখনও তাদের (মুসলমানদের) পক্ষ থেকে কার্যত কাফিরদের কোনো প্রকার জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু কুরয বিন জাবেরের আক্রমণের ফলে মুসলমানদের কার্যত ক্ষতি হয়েছিল। অর্থাৎ, মুসলমানরা কুরাইশের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেও বাস্তবে কাফিররাই প্রথমে যুদ্ধের সূচনা করে।

এরপর **আবদুল্লাহ্ জাহ্শ (রা.)'র অভিযান**। মক্কার নিকটে নাখলা উপত্যকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) রজব মাসে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)-কে আটজন মুহাজিরসহ প্রেরণ করেন। এদের মাঝে কোনো আনসার সদস্য ছিল না। তাদেরকে একটি চিঠি লিখে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর এই চিঠি খুলবে এবং এতে লিখা নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে। নিজের কোনো সঙ্গীকে তোমার সাথে যেতে বাধ্য করবে না। যখন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন

জাহ্‌শ (রা.) দু'দিন সফরের পর সেই নির্দেশনা-পত্র খুলে পাঠ করেন। তাতে লিখা ছিল, তুমি আমার এই চিঠি খুলে পড়ার পর নিজেদের সফর অব্যাহত রাখবে আর তায়েফ এবং মক্কার মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে কুরাইশের গতিবিধির ওপর নযর রাখবে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবগত করবে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন জাহ্‌শ (রা.) এই পত্র পাঠ করে বলেন, আমার জন্য শোনা এবং আনুগত্য করা আবশ্যক। এরপর নিজের সঙ্গীদের তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন নাখলা অভিমুখে যাই এবং সেখানে কুরাইশের কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখি; যাতে মহানবী (সা.)-কে কুরাইশের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করতে পারি। তিনি তোমাদের মধ্য হতে কাউকে আমার সাথে যেতে বাধ্য করতে বারণ করেছেন। অতএব তোমাদের মাঝে যে শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা রাখে সে আমার সাথে চলো আর যে ফিরে যেতে চায় সে ফিরে যাক। কিন্তু তার সঙ্গীদের মধ্য হতে কেউই ফেরত যায় নি বরং সবাই হিজায অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে এক জায়গায় হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত উতবা বিন গাযওয়ানের উট হারিয়ে যায়। তারা দু'জন সেগুলোর অনুসন্ধান করতে থাকে আর হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন জাহ্‌শ (রা.) বাকি সঙ্গীদের নিয়ে নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে যান। সেপথে কুরাইশের একটি কাফেলা যাচ্ছিল, যারা কিশমিশ, চামড়া এবং কুরাইশদের বাণিজ্য পণ্য বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই দলে আমর বিন হাযরামীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের (সেখানে) দেখে ভয় পেয়ে যায়। হযরত উকাশাহ্‌ বিন মেহসান (রা.) তাদের সামনে আসেন, তিনি তার মাথা মুড়িয়ে রেখেছিলেন। কাফিররা তাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয় এবং বলতে আরম্ভ করে, ভয়ের কোনো কারণ নেই; এরা উমরা করতে যাচ্ছে। এরপর মুসলমানরা সেখানে পরামর্শ করেন যে, আজকে রজব (মাসের) শেষ দিন। আমরা যদি তাদের সাথে লড়াই করি এবং তাদেরকে হত্যা করি তাহলে এতে পবিত্র মাসের সম্মান লঙ্ঘিত হবে আর আজ যদি অপেক্ষা করি তাহলে তারা রাতারাতি হেরেমের সীমান্তে ঢুকে যাবে আর আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। অবশেষে সবাই একথায় একমত হয় যে, (বাণিজ্য) কাফেলার ওপর আক্রমণ করা হোক। ইতঃপূর্বে সাহাবীদের স্মৃতিচারণে একবার এর বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছিল। হযরত ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ তামীমী উমর বিন হাযরামীকে লক্ষ্য করে এমনভাবে একটি তির নিক্ষেপ করেন যার ফলে সে মারা যায়, এছাড়া মুসলমানরা দু'জনকে আটক করে এবং একজন পালাতে সক্ষম হয়। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন জাহ্‌শ (রা.) উটগুলো এবং ঐ দু'জন বন্দীকে নিয়ে মদীনায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন জাহ্‌শ (রা.) যখন মদীনায় পৌঁছান তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমি তো তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার আদেশ দেই নি? তিনি (সা.) উটগুলো এবং দু'জন বন্দীকে (সেখানেই) রেখে দেন এবং সেগুলোর মধ্য হতে কোনো কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। {এই যে বলা হয় যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল লুটপাট করা! লুটপাট করা উদ্দেশ্য ছিল না। (উদ্দেশ্য যদি এটি হতো) তাহলে তিনি (সা.) তাদেরকে বাহবা দিতেন (এবং) বলতেন তোমরা ভালো করেছ।} তিনি (সা.) বলেন, তোমরা মন্দ কাজ করেছ। অপরদিকে কুরাইশও হৈ-চৈ আরম্ভ করে যে, মুসলমানরা নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করেছে। আর যেহেতু নিহত ব্যক্তি আমর বিন হাযরামী একজন রঈস বা নেতৃস্থানীয় মানুষ ছিল এবং মক্কার নেতা উতবাহ্‌ বিন রবীয়াহ্‌'র মিত্রও ছিল, এ কারণে এই ঘটনা কুরাইশের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃত ঢেলে দেয় আর তারা পূর্বের তুলনায় অধিক আক্রোশে মদীনার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। অতএব, বদরের যুদ্ধ মূলত কুরাইশের এই প্রস্তুতি ও চরম শত্রুতারই ফলাফল ছিল।

মোটকথা, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমান ও কাফির উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক বাক-বিতণ্ডা হয়, অবশেষে নিম্নোক্ত কুরআনের ওহী অবতীর্ণ হওয়া মুসলমানদের শান্তনার কারণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا

(সূরা আল্ বাকারা: ২১৮)

অর্থাৎ, তারা তোমাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে অর্থাৎ তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু পবিত্র মাসে আল্লাহ্র ধর্ম হতে লোকদের জোর করে বাধা প্রদান করা বরং পবিত্র মাস ও 'মসজিদুল হারাম' উভয়কে অস্বীকার করা, (অর্থাৎ এর সম্মান পদদলিত করা) এরপর হারামের এলাকা থেকে এর অধিবাসীদের বাহুবলে বের করে দেয়া (যেভাবে হে মুশরিকরা! তোমরা করছ) এসব বিষয় পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। আর নিশ্চয় পবিত্র মাসে দেশের ভেতরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা সেই হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট, যা নৈরাজ্য দমনের জন্য করা হয়। আর হে মুসলমানগণ! কাফিরদের স্বরূপ হলো, তারা তোমাদের শত্রুতায় এতটাই অন্ধ হয়ে গেছে যে, যে কোনো সময় এবং যে কোনো জায়গায় তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে দ্বিধা করবে না এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, এই কাফিররা মুসলমানদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করতে থাকবে। আর একারণে সেই সময়ে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি। অতএব, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের হিংস্র প্রপাগাণ্ডা পবিত্র মাসগুলোতেও চলমান রাখতো বরং পবিত্র মাসগুলোর বিভিন্ন সমাবেশ এবং সফরকে ব্যবহার করে তারা সেসব মাসে নিজেদের নৈরাজ্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডে আরো গতি সঞ্চার করতো। এরপর চরম নির্লজ্জের মতো নিজেদের হৃদয়কে মিথ্যা প্রবোধ দেওয়ার জন্য সম্মানিত মাসগুলোকে আগে-পিছে করে দিত, যাকে তারা নাসী নামে সম্বোধন করতো। কাজেই, এই উত্তরে মুসলমানদের তো আশ্বস্ত হওয়ারই কথা, (এমনকি) কুরাইশরাও কিছুটা দমে যায়। তারা জানতে পারে যে, ওহী হয়েছে। ইত্যবসরে তাদের প্রতিনিধি দুই বন্দীকে ছাড়িয়ে নিতে মদীনায় এসে পৌঁছে। কিন্তু তখনো যেহেতু সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং উতবাহ্ (রা.) ফিরে আসেন নি আর তাদের বিষয়ে মহানবী (সা.)-এরও গভীর আশঙ্কা ছিল যে, কুরাইশের হাতে ধরা পড়লে কুরাইশরা তাদের জীবিত ছাড়বে না এজন্য, তিনি (সা.) তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আমার লোকেরা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছলে আমি তোমাদের লোকদের ছেড়ে দিব। অবশেষে তারা দু'জন যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) মুক্তিপণ নিয়ে দুই যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দেন।

গযওয়া বদরুল্ কুবরা। পবিত্র কুরআনে এই যুদ্ধকে **ইয়াওমুল ফুরকান** আখ্যা দেয়া হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, **"বদরের দিনই মহানবী (সা.)-এর 'ফুরকান' ছিল যেদিন বিরুদ্ধবাদীদের শক্তিশালী নেতারা নিহত হয়েছে এবং মুসলমানরা বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছে।"** ফুরকান শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) অপর এক স্থানে বলেন, **"পবিত্র কুরআন থেকে এ শব্দের যে অর্থ**

আমি বুঝতে পেরেছি তা হলো, ফুরকান সেই বিজয়ের নাম যার পর শত্রুর কমর ভেঙ্গে যায় আর এটি ছিল বদরের দিন।” এই যুদ্ধকে **বদরুস্ সানীয়া, বদরুল্ কুবরা, বদরুল্ উযমা এবং বদরুল্ কিতালও** বলা হয়।

মহানবী (সা.) সংবাদ পান, আবু সুফিয়ান কুরাইশের বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরছে, এ কাফেলায় এক হাজার উট রয়েছে। এ কাফেলায় কুরাইশের অনেক বড় মূলধন বিনিয়োগ করা ছিল। যার কাছে এক মিসকাল (স্বর্ণমুদ্রা) অথবা চার পাঁচ মাশা (১ মাশায় চার আনা) পরিমাণও সোনা বা সম্পদ ছিল সেও এই কাফেলায় তা বিনিয়োগ করেছিল। বলা হয়, এতে বিপুল পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এ কাফেলায় ত্রিশ, চল্লিশ অথবা অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সত্তর জন্য সদস্য ছিল। এটা সেই কাফেলা ছিল, মহানবী (সা.) এর আগেও যেটির পিছু ধাওয়া করে উশায়রা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু এই কাফেলা সিরিয়া অভিমুখে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই অভিযানের জন্য মহানবী (সা.) ২য় হিজরী সনে জমাদিউল্ উলা বা জমাদিউল্ আখেরায় যাত্রা করেন। এই কাফেলার ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে তাঁর সাথে বের হওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, এটি কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলা, এতে তাদের ধন-সম্পদ রয়েছে। অতএব, তোমরা বের হও; আল্লাহ্ তোমাদেরকে গণিমতের মালে ধন্য করতে পারেন। কতিপয় লোক যারা আপত্তির জায়গা সন্ধানে অভ্যস্ত বা খুব একটা জ্ঞান রাখে না তারা আপত্তি করে, মুসলমানরা মদীনায় গিয়ে যেন লুটপাট করা আরম্ভ করে দিয়েছিল আর উদাহরণ হিসাবে তারা এই কাফেলার পিছু ধাওয়ার ঘটনাকে উপস্থাপন করে যা শতভাগ অজ্ঞতা ও মুর্খতার পরিচায়ক এবং তৎকালিন যুদ্ধরীতি ও অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফসল। কেননা, সেসময় কুরাইশের এই বাণিজ্যিক কাফেলাকে প্রতিরোধ করা কোনো আপত্তিজনক বিষয় ছিল না। যেমন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন,

কাফেলা প্রতিরোধের জন্য বের হওয়া মোটেও আপত্তিজনক ছিল না কেননা প্রথমত: মুসলমানরা যে বিশেষ কাফেলার জন্য বেরিয়েছিল তা কোনো সাধারণ কাফেলা ছিল না। এতে কুরাইশের সব পুরুষ ও মহিলার বাণিজ্যিক অংশিদারিত্ব ছিল। এ থেকে বুঝা যায়, কুরাইশ নেতাদের পরিকল্পনা ছিল, এর মুনাফা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, এই মুনাফাই উহুদের যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যয় করা হয়েছে। অতএব, এই কাফেলাকে প্রতিরোধ করা যুদ্ধকৌশলের জরুরী অংশ ছিল। দ্বিতীয়ত: মোটের ওপর কুরাইশের কাফেলাকে প্রতিরোধ করা অপরিহার্য ছিল কেননা, এই কাফেলাগুলো যেহেতু সশস্ত্র থাকত এবং মদীনার একান্ত পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করত, এজন্য সর্বদাই তাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের আক্রান্ত হবার আশঙ্কা বা ঝুঁকি থাকত, যা দূর করা আবশ্যক ছিল। তৃতীয়ত, এই কাফেলা যে পথেই যেত আরব গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরমভাবে উত্তেজিত করত, যার দরুন মুসলমানদের অবস্থা ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছিল। অতএব তাদের পথ রোধ করা প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক কর্মসূচির অংশ ছিল। চতুর্থত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুরাইশের জীবিকা নির্বাহ হতো ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে, তাই উক্ত কাফেলাগুলোর পথ রোধ করা অত্যাচারী কুরাইশদের সম্বিত ফিরিয়ে আনা এবং তাদেরকে যুদ্ধমূলক কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখা আর শান্তিসন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করার একটি অতি উত্তম মাধ্যম ছিল। বর্তমান যুগেও যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কতক রাষ্ট্র বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে, তা-ও আবার ভ্রান্ত এবং অন্যায়ভাবে আরোপ করে থাকে, এটিও

নিষেধাজ্ঞা আরোপমূলক একটি বিষয় ছিল। এ ছাড়া এসব কাফেলার পথ রোধ করার উদ্দেশ্য লুটপাট করা ছিল না, বরং যেভাবে পবিত্র কুরআন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, এই বিশেষ অভিযানে মুসলমানদের কাফেলার (মুখোমুখি হওয়ার) আকাঙ্ক্ষা তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং এর মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের কষ্ট ও পরিশ্রম কম হওয়ার আশা ছিল।

যাহোক, মহানবী (সা.) সেই কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্বীয় দু'জন সাহাবী হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) ও হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-কে অগ্রে প্রেরণ করেন। এই দু'জন সাহাবী মদীনা হতে রওয়ানা হন এবং কাফেলা সম্পর্কে সংবাদ লাভের পর মদীনায় যখন ফেরত আসেন তখন তাঁরা জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.) সেখান হতে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। অতএব এই দু'জনও বদর অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ সে সময় হয় যখন তিনি (সা.) বদরের যুদ্ধ শেষে ফেরত আসছিলেন। তারা যদিও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁদের জন্যও গণিমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অংশ রাখেন। অপরদিকে আবু সুফিয়ান তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে এই সংবাদপ্রাপ্ত হয় যে, মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তার বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, আবু সুফিয়ানের সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় যে তাকে বলে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) শুরু থেকেই এই কাফেলার পথ রোধ করতে চাচ্ছিলেন এবং এটিও বলে যে, এখন সে মহানবী (সা.)-কে এই কাফেলার জন্য অপেক্ষমান অবস্থায় দেখে এসেছে। এই খবর শুনে আবু সুফিয়ান অনেক বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সে যমযম বিন আমর গিফারী নামক এক ব্যক্তিকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে মক্কা অভিমুখে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠায় যে, সে যেন মক্কা গিয়ে তাদেরকে বলে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথীদের নিয়ে তোমাদের কাফেলার ওপর আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। সুতরাং যমযম অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে রওয়ানা হয়ে যায়। যখন আবু সুফিয়ানের বার্তাবাহক মক্কায় পৌঁছায় তখন সে আরবের রীতি অনুযায়ী একটি ভীতিপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে যে, হে মক্কাবাসী! তোমাদের কাফেলার ওপর আক্রমণ করার জন্য মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ বেরিয়ে পড়েছেন, যাও তাদের রক্ষা করো। অপরদিকে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংবাদ সংগ্রহ করে মুসলমানদের সেই সৈন্যদলের পথ এড়িয়ে সফর অব্যাহত রাখে। সে বদরের ঝরনার নিকট পৌঁছে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে যে, এখানে কি তুমি কাউকে দেখতে পেয়েছ? সে বলে, এখানে দু'জন ব্যক্তি এসেছিল এবং সেই টিলার পেছনে উট বসিয়ে পানি নিয়ে চলে যায়। আবু সুফিয়ান উট রাখার স্থানে যায়। সেখানে উটের বিষ্ঠা পড়ে ছিল। সে একটি উঠায় এবং তা ভেঙে দেখতে পায় যে, তার মধ্যে খেজুরের বীচি আছে। সে এটি দেখে বলে যে, এটি মদীনার উটের খাবার এবং বুঝে যায় যে, মদীনাবাসীরা পাশেই কোনো স্থানে আছে। সে দ্রুত কাফেলার কাছে ফিরে আসে আর নিজ সাথীদের নিয়ে পরিচিত রাস্তা এড়িয়ে সমুদ্র উপকূলের পথ ধরে বেরিয়ে যায় আর বদরকে এক পাশে রেখে দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়। এ বিষয়ে আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের এক বিস্ময়কর স্বপ্নও আছে এবং সেই স্বপ্ন খুবই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সেই স্বপ্নটি হলো, আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, যিনি মহানবী (সা.)-এর ফুপু এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার মা ছিলেন, তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। অনেকের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। যাহোক,

তিনি আবু সুফিয়ানের দূত যমযমের মক্কায় পৌঁছানোর তিন রাত পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেন, যেটি তাকে ভীতত্রস্ত করে তুলে। তিনি তার ভাই আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, হে আমার ভাই! খোদার কসম! আমি আজ রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি যেটি আমাকে ভীষণ ভীতত্রস্ত করেছে। আমার শঙ্কা হলো তোমার জাতির ওপর কোনো ভয়াবহ বিপদ আপতিত হবে। তুমি এই রহস্যকে গোপন রাখবে যা আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি। এক রেওয়ায়েত অনুসারে আতেকা আব্বাসকে বলেন, যতক্ষণ তুমি আমার সাথে এই অঙ্গীকার না করছো যে, একথা তুমি কাউকে বলবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে সেই স্বপ্ন বলব না, কেননা মক্কার কুরাইশরা যদি একথা শুনে তাহলে তারা আমাদেরকে বিরক্ত করবে এবং আমাদেরকে গালমন্দ করবে। অতএব হযরত আব্বাস তাঁর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। যাহোক, এরপর হযরত আব্বাস জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি (স্বপ্নে) কী দেখেছো? আতেকা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, উটে আরোহিত এক ব্যক্তি আসে এবং আবতাহ'র ময়দানে দাঁড়িয়ে যায়। মক্কা এবং মিনার অঞ্চলকে আবতাহ বলা হয় এবং (এ জায়গাটি) মিনার অধিক নিকটবর্তী। এরপর সেই ব্যক্তি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলে, হে লোকসকল! তিন দিনের মাঝে নিজেদের নিহত হওয়ার স্থানে চলে এসো। আতেকা বর্ণনা করেন যে, এরপর আমি দেখি যে, লোকেরা সেই ব্যক্তির কাছে গিয়ে একত্রিত হয়ে গেছে। এরপর সেই ব্যক্তি মসজিদ তথা খানা কা'বায় প্রবেশ করে। লোকেরা তার পিছন পিছন আসে। লোকেরা তার কাছে একত্রিত থাকা অবস্থায় আমি দেখলাম যে, তার উট তাকে নিয়ে কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সে তদ্রুপ চিৎকার করে বলে, হে লোকসকল! তিন দিনের মধ্যে নিজেদের নিহত হওয়ার স্থানে চলে যাও। এরপর আমি দেখি যে, তার উট তাকে আবু কুবায়েস নামক পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবু কুবায়েস পাহাড়ের বিষয়ে লেখা আছে যে, এটি মক্কার পূর্বদিকে একটি বিখ্যাত পাহাড়ের নাম। সেখান থেকেও সে উচ্চস্বরে চিৎকার দেয়। এরপর সে একটি পাথর সেই পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে ফেলে দেয় আর নীচে পড়েই সেই পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে যায় আর মক্কার ঘরগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি ঘরও এমন অবশিষ্ট ছিল না যেটিতে সেই পাথরের একটি টুকরো যায়নি। একথা শোনার পর হযরত আব্বাস আতেকাকে বলেন, খোদার কসম, এ তো খুবই অর্থবহ স্বপ্ন। তুমি নিজেও এই স্বপ্ন গোপন রাখবে এবং কারো কাছে এর উল্লেখ করবে না। এরপর হযরত আব্বাস আতেকার ঘর থেকে বের হলে পথিমধ্যে ওয়ালীদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে হযরত আব্বাসের বন্ধু ছিল। নিজে তো বোনকে বলেছিলেন যে, কাউকে (স্বপ্নের কথা) বলো না, কিন্তু নিজেই ওয়ালীদের কাছে স্বপ্নের উল্লেখ করেন। তবে হযরত আব্বাস তাকে বলেন যে, এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু একবার কথা যখন মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় তখন তা ছড়াতেই থাকে। ওয়ালীদ তার পিতা উতবার কাছে উক্ত স্বপ্নের উল্লেখ করে। এভাবে এ কথা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে এবং যেখানেই দু'জন বসত সেখানেই উক্ত স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করত। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, পরবর্তী দিন সকালে আমি যখন খানা কা'বায় তওয়াফ করার উদ্দেশ্যে যাই তখন সেখানে দেখি আবু জাহল কুরাইশের কয়েকজন লোকের সাথে বসে আছে। আমাকে দেখে সে বলে, হে আবুল ফযল! (এটি হযরত আব্বাসের উপনাম) তওয়াফ শেষে আমার সাথে দেখা করে যেও। হযরত আব্বাস বলেন, আমি তওয়াফ শেষে তার কাছে গেলে তখন আবু জাহল আমাকে বলে, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমাদের মধ্যে কবে থেকে মহিলা নবীর উদ্ভব হলো? আমি বললাম, মানে কী? সে বলে, তোমাদের পুরুষরা তো নবুয়্যতের দাবি করেছেই, অর্থাৎ সে মহানবী

(সা.)-এর প্রতি তির্যক ইঙ্গিত করে; এখন তোমাদের নারীরাও নবুয়্যতের দাবি করা শুরু করেছে! আতেকা এটি কী স্বপ্ন দেখেছে? হযরত আব্বাস বলেন, আমি বললাম, সে কী স্বপ্ন দেখেছে? আবু জাহল বলে, সে বলেছে, আমি এক ব্যক্তিকে উটে আরোহিত অবস্থায় আসতে দেখেছি আর সে উচ্চস্বরে কিছু বলে আর এরপর একটি পাথর পাহাড় থেকে ফেলে দেয়। মোটকথা সে পুরো স্বপ্ন শুনিয়ে দেয়। আবু জাহল পুনরায় বলে, আমরা তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব, যদি স্বপ্ন অনুসারে ঘটনা ঘটে তাহলে ঠিক আছে, নতুবা আমরা একটি নোটিস লিখে কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেবো যে, তোমরা সমস্ত আরবে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। আব্বাস বলেন, খোদার কসম! আমাকে বাধ্য হয়ে এ স্বপ্নকে অস্বীকার করতে হয়, অর্থাৎ আতেকা কোনো স্বপ্ন দেখেছে এমন কথাকে অস্বীকার করি। এরপর আমরা সবাই এ সভা থেকে উঠে পড়ি। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়িতে যাই তখন বনু আব্দুল মুত্তালিবের সব মহিলা আমার কাছে আসে এবং আমাকে বলে, পূর্বে সেই নোংরা পাপিষ্ঠ লোকটি তোমাদের পুরুষদের দোষারোপ করে আর তুমি তা সহ্য করেছো আর এখন সে নারীদের বাজে কথা বলছে আর তুমি চুপচাপ তা শুনছো এবং তার অপলাপের কোনো জবাব দিচ্ছো না! তোমার আত্মাভিমান কোথায় গেল? সেই বংশের নারীরা তাকে কিছুটা ধিক্কার দেয়। আব্বাস বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, খোদার কসম! আমি এমনটিই করেছি। আমার মতে এর চেয়ে বড় কোনো অপরাধ নেই। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এখন তার কাছে যাব এবং এরপর যদি সে এমন আর কোনো কথা বলে তাহলে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে হত্যা করব। হযরত আব্বাস বলেন, আতেকার স্বপ্নের তৃতীয় দিন আমি যখন সকালে ঘর থেকে বের হই তখন প্রচণ্ড উত্তেজিত ছিলাম (চিন্তা করছিলাম,) সেদিন আমার যে কাপুরুষতা প্রকাশ পেয়েছে আজ এর প্রতিশোধ নিব। আমি মসজিদে প্রবেশের পর আবু জাহলকে দেখলাম। সে ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ও কটুভাষী মানুষ ছিল। খোদার কসম! আমি তাঁর দিকে এ উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম যেন সে যদি পুনরায় এমন কোনো কথা বলে যা পূর্বে বলেছিল তাহলে আমি তার হিসাব চুকিয়ে দিব। কিন্তু আমি এ কী দেখলাম! আবু জাহল দৌড়ে মসজিদ, অর্থাৎ কাবাঘরের দরজার দিকে যাচ্ছে। আমি মনে মনে বলছিলাম, তার ওপর আল্লাহ্ তা'লার অভিসম্পাত হোক! তার কী হয়েছে? সে কি এ ভয়ে পালাচ্ছে যে, আমি তাকে বকাঝকা করব? কিন্তু প্রকৃত বিষয় ছিল, সে যমযম বিন আমর গিফারির উচ্চ আওয়াজ শুনেছিল যা আমি তখনও শুনিনি আর সে (অর্থাৎ যমযম) উপত্যকার মাঝে তার উটে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করছিল। সে তার উটের নাক ও কান কেটে দিয়েছিল এবং হাওদাকে উল্টে দিয়েছিল এবং নিজের কাপড় ছিড়ে ফেলেছিল আর উচ্চস্বরে বলছিল, কাফেলা কাফেলা! অর্থাৎ তোমাদের এই কাফেলাকে রক্ষা করো। এতে তোমাদের বাণিজ্যপণ্য রয়েছে যা আবু সুফিয়ানের সাথে আসছে। তাদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথীরা বেরিয়ে পড়েছে। সে বলে আমি মনে করি না যে, তোমরা সময় থাকতে পৌঁছতে পারবে। অর্থাৎ যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সেখানে পৌঁছো। আমার মনে হয় না তোমরা তাদের সাহায্যার্থে পৌঁছাতে পারবে। যাহোক, আব্বাস বলেন, এই নতুন ঘটনা আমাকে এবং তাকে এতটা ব্যতিব্যস্ত করে তুলে যে, আমরা প্রথম বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিনি। লিখিত আছে যে, মক্কার কুরাইশরা যমযমের আওয়াজ শুনতেই খুবই উত্তেজিত হয়ে যায় এবং লোকদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য উস্কানি দিতে থাকে। সে বলতে থাকে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথীরা কি এটি মনে করে যে, এটি ইবনে হাযরামীর বাণিজ্যিক কাফেলার ন্যায় কোনো কাফেলা! মোটেও নয়, খোদার কসম! তারা জানতে পারবে যে, বিষয়টি এমনটি নয়। আমর বিন হাযরামির কাফেলা এবং মুসলমানদের হাতে তার

নিহত হওয়ার ঘটনা আব্দুল্লাহ্ বিন জাহশের যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে মুসলমানরা খুব সহজেই ইবনে হাযরামিকে হত্যা করেছিল এবং তার ধনসম্পদের নিয়ন্ত্রণ তারা নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। যাহোক, তখন মক্কার কুরাইশরা (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। হয় তারা সবাই সশরীরে যুদ্ধের জন্য বের হচ্ছিল অথবা নিজের জায়গায় অন্য কাউকে নিজ খরচে পাঠাচ্ছিল। তাদের একজন সরদার বলে, তোমরা কি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাবী সঙ্গীদের আর মদীনাবাসীকে তোমাদের সম্পদ লুটপাট করে নেয়ার অনুমতি দেবে? যার ধনসম্পদের প্রয়োজন তার জন্য আমার সম্পদ রাখা আছে আর যার খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন তা-ও (তার ইচ্ছামতো ব্যবহারের জন্য) রাখা আছে। কেউ ২০০ দিনার, কেউ ৩০০ দিনার আর কেউ ৫০০ দিনার দিয়ে বলে, যেখানে চাও এবং যেভাবে চাও খরচ করো। যুদ্ধের জন্য কেউ ২০টি উট উপস্থাপন করে, কেউবা আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা লোকদের পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নেয়। আর যে নিজে যুদ্ধে যেতে পারেনি সে খরচ দিয়ে তার স্থলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে দুই বা তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। এখানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, সে ঘোষণা দিয়েছিল যে, (সেখানে) অবিলম্বে পৌঁছাও, তথাপি তারা যুদ্ধের জন্য দুই-তিন দিন ধরে খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয় আর এই প্রস্তুতি থেকেই বুঝা যায় যে, মুসলমানদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধের জন্য মক্কার কাফিররা কোনো অজুহাত খুঁজছিল। অন্যথায় যদি কাফেলা রক্ষাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতো তাহলে যেভাবে খবর দেয়া হয়েছিল তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছার কথা ছিল। যার হাতে যে অস্ত্র ছিল তা নিয়েই চলে যেত, কিন্তু এমনটি হয়নি, বরং তারা কাফেলা রক্ষার পরিবর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে যায়।

আবার কুরাইশ নেতাদের সম্পর্কে লেখা আছে যে, **কুরাইশের ৫জন নেতা– উমাইয়া বিন খালফ, উতবা বিন রবীয়া, শায়বা বিন রবীয়া, জামা বিন আসওয়াদ এবং হাকিম বিন হিযাম** তির দিয়ে (এ বিষয়ে) লটারী করে যে, যুদ্ধে যাওয়া উচিত, কি-না। এর ফলাফল নেতিবাচক আসে। (এর মানে) এসব লোকের যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ (লটারীতে) সেই তির বের হয় যার গায়ে লেখা ছিল, 'এটি কোরো না'। তাই তারা সবাই মিলে যুদ্ধে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আবু জাহল তাদের কাছে এসে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করে। এ ব্যাপারে উকবা বিন আবু মুয়িত এবং নাযর বিন হারেসও আবু জাহলকে সমর্থন করে আর তাদেরকে সাথে নিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেয়। উতবা ও শায়বার ক্রীতদাস তাদের বলে, আল্লাহ্র কসম! আপনারা দু'জন যুদ্ধে নয়, বরং নিহত হওয়ার যায়গায় যাচ্ছেন। ফলে তারা উভয়েই যুদ্ধে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, কিন্তু আবু জাহল এত বেশি চাপ দেয় যে, তারা উভয়েই পথ থেকে ফিরে আসার অভিপ্রায় নিয়ে সবার সাথে যেতে রাজি হয়। যুদ্ধের জন্য কাফিরদের প্রস্তুতি এবং যাত্রার বিশদ বিবরণ আর এর ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। এ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)